হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা জীবন

ইউনিট ৩

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে আরবসহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, বর্বরতা ও মানবতা বিরোধী অপরাধে ছেয়ে গিয়েছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। মানবতার এ চরম দুর্দিনে পথহারা মানবজাতিকে সত্য, ন্যায় ও মুক্তির পথ দেখালেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে আল আমীন বা সত্যবাদী ব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নবুওয়্যাত লাভের পর থেকে স্বার্থবাদী লোকেরা তাঁর বিরোধীতা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে এ বিরোধীতা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীদের জীবন অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন
পাঠ ৩.২ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত লাভ
পাঠ ৩.৩ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচার
পাঠ ৩.৪ : ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের বাধা ও ষড়যন্ত্র
পাঠ ৩.৫ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ
পাঠ ৩.৬ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরত

পাঠ-৩.১ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.)-এর শৈশব ও যৌবনকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মরুভূমি, কুরাইশ, সাদ গোত্র, হারবুল ফুজ্জারে, আল আমীন, বুহায়রা ও হালিমা**

রাসূল (সা.)-এর আরবে আগমনের প্রেক্ষাপট

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেরণের জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি আরবের মক্কাভূমির ওপর পতিত হলো কেন, এর কারণ অনুসন্ধান করলে একাধিক উত্তর পাওয়া যাবে। যেমন- মক্কা নগরী মোটামুটিভাবে ভূমন্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত, আরব দেশ থেকে যত সহজে অন্যান্য দেশে যাতায়াত করা যায়, অন্য কোনো দেশ থেকে তা আদৌ সম্ভব হয় না। সারা জগতের মুক্তির কান্ডারির ভূমন্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মরুময় আরব দেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত ছিল। আরব জাতি ব্যতীত অন্য প্রত্যেক জাতিই মানুষের রচিত এক একটা ধর্মপদ্ধতির অনুসারী ছিল। তাছাড়া পৃথিবীর সকল অনাচারের প্রতিকার ও সকল অবিচারের প্রতিবিধান করার জন্য যিনি আসবেন তাঁকে এমন দেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত, যেখানে তিনি অল্প চেষ্টাতেই নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতিপয় উপযুক্ত সহচর পাবেন। আরব ছাড়া আর কোথাও মনে হয় এটা সম্ভব ছিল না। অন্য সকল দেশ ও অঞ্চলে তখন পুরোহিতদের প্রচন্ড প্রতাপে মানুষের জ্ঞান-বিবেক সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মানবজাতির ত্রাণকর্তা, সর্বশেষ রাসূলকে প্রেরণের জন্য সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি আরব মরুভূমির মক্কা নগরীকেই মনোনীত করে।

বংশ পরিচিতি

হযরত ইবরাহীম (অ)-এর সুযোগ্য পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর অধস্তন বংশধরদের থেকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের গোড়াপত্তন হয়। 'কুরাইশ' উপাধি সর্বপ্রথম ফিহর গ্রহণ করেছিলেন। ফিহরের অধস্তন বংশধররাই কুরাইশ নামে পরিচিত। 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ 'একত্র করা'। কেননা কুসাই মক্কার লোকদের একই সম্পর্কে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এজন্য তাঁর গোত্রের নাম 'কুরাইশ' রাখা হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফিহরের স্বনামধন্য অধস্তন 'কুসাই' মক্কা নগরীসহ সমগ্র হিজাযে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র কাবা ঘরকে সমগ্র আরব দেশ থেকে মক্কা নগরীতে আগত লোকদের একত্র হওয়ার স্থানে পরিণত করেন।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মুত্তালিব হিজাযের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আবিসিনিয়ার রাজা আবরাহা কাবাঘর ধ্বংস করার উদ্দেশে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কা শরীফে আসে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবাবিল নামক ক্ষুদ্র পাখির দল পাঠিয়ে তাদের সমূলে ধ্বংস করেন। পবিত্র কুরআনে সূরা ফীল-এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে এসেছিল বলে এ বছরকে 'আমুল ফীল' বা হস্তির বছর বলা হয়। আবদুল মুত্তালিবের দ্বাদশ পুত্র আবদুল্লাহর সাথে ইয়াসরিব (মদিনা)-এর বনু যুহরা গোত্র প্রধান আবদুল ওহাবের কন্যা আমিনার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি আমিনাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। বাণিজ্য শেষে প্রত্যাগমনের সময় মদিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে ৫টি উট, স্বল্পসংখ্যক বকরি ও ভেড়া এবং উম্মে আয়মান নাম্নী এক দাসী রেখে যান। এ সময় বিবি আমিনা সন্তানসম্ভবা ছিলেন।

জন্ম

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মতারিখ নির্ধারণে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক তাবারি, ইবনে খালদুন, ইবনে হিশাম প্রমুখ ১২ রবিউল আউয়াল নির্দেশ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল ফিদা বলেন, দশ তারিখে হযরত (সা.)-এর জন্ম হয়েছিল। মিসরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ মাহমুদ পাশা আল-ফালাকী গাণিতিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মতারিখ ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। জন্মের সপ্তম দিনে আব্দুল মুত্তালিব আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনকে আকিকা উৎসবে করে, তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ', অর্থ- পরম প্রশংসিত। আর বিবি আমিনা পুত্রের নাম রাখেন 'আহমদ', অর্থাৎ পরম প্রশংসাকারী। মুহাম্মদ ও আহমদ ও উভয় নামই বাল্যকাল থেকে প্রচলিত ছিল। কুরআন মাজীদে রাসূল (সা.) এর দুটি নামেরই উল্লেখ আছে।

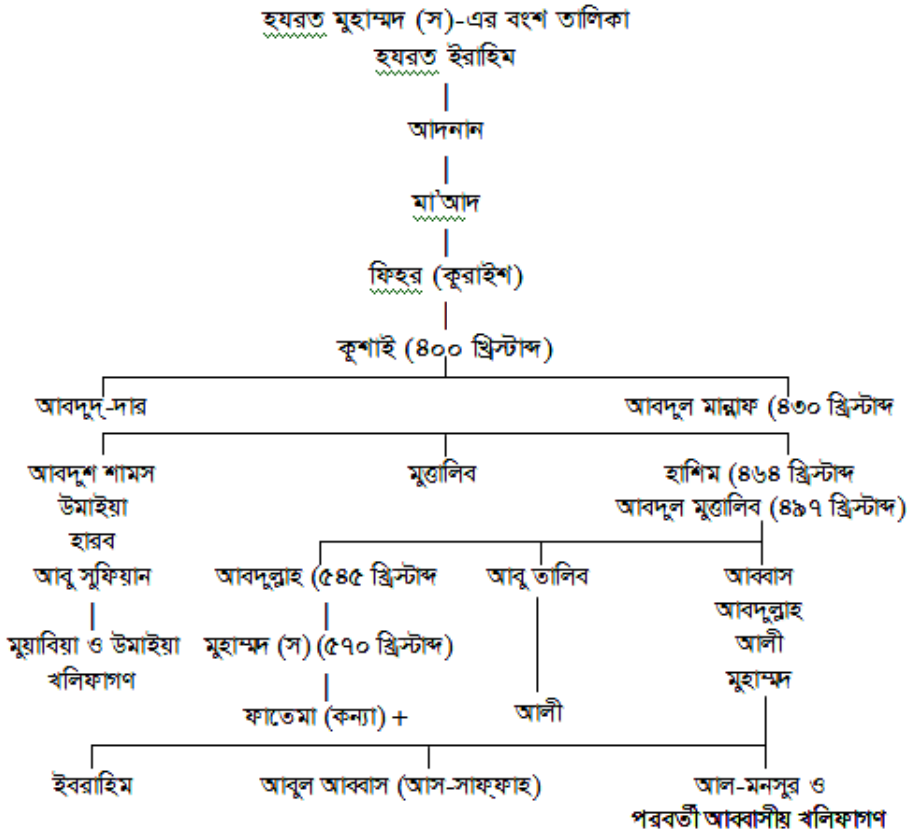

ধাত্রীগৃহে অবস্থান

জন্মের পর প্রথম দু'তিন দিন শিশু (সা.) মাতৃদুগ্ধ পান করেন। তার পর আবু লাহাবের সুওয়াইবা নাম্নী দাসী তাঁকে দুগ্ধ পান করান। তখনকার দিনে আরবে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবারে কোনো শিশু জন্ম নিলে তার স্তন্যদান ও লালন-পালনের ভার ধাত্রীর ওপর ন্যস্ত হতো। অবশ্য এজন্য ধাত্রীমাতা যথাযথ পুরস্কার ও সম্মানী পেত। মুহাম্মদ (সা.)-এর লালন-পালনের ভার মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, উন্নতমনা, বিশুদ্ধভাষী বনু সাদ গোত্রের হালিমার হাতে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সাদ গোত্রে প্রতিপালিত হয়ে তাদের বিশুদ্ধ ভাষা রপ্ত করেছি, এজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী।" ধাত্রীর মাতা হালিমার কাছ থেকে মাতৃসদনে স্থানান্তরিত হওয়া ষষ্ঠ বছরে শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মা আমেনা মদিনায় গিয়ে পিতৃকুলের সকলের সঙ্গে শিশু মুহাম্মদের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং স্বামীর কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এজন্য উম্মে আয়মান নাম্নী পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা যাত্রা করেন। মদিনায় পৌঁছে আমিনা শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করেন ফিরার পথে মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানে

মাতৃবিয়োগের দুই বছর যেতে না যেতেই কালের কঠোর হস্ত তাঁকে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব স্নেহপূর্ণ বক্ষ থেকে অপসারিত করে। আবদুল মুত্তালিব ৮২ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান। দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কিশোর মুহাম্মদ পারিবারিক ও ব্যবসায়িক বিভিন্ন কাজে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সিরিয়া গমন

আনুমানিক ৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বয়স যখন বারো বছর দু'মাস, তখন পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে (সিরিয়া) যাত্রা করেন। এ সময় সিরিয়ার বসরা নগরের এক গির্জায় বুহায়রা নামক এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক অবস্থান করতেন। এ যাত্রায় কুরাইশ প্রধানের অনেকেই আবু তালিবের সঙ্গী হয়েছিলেন।

আল আমীন উপাধি

বাল্যকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুর্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধ্যানে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। নম্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা, সাধুতা ও সৎস্বভাবের জন্য আরববাসী তাঁকে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করে। অবশেষে 'মুহাম্মদ' (সা.) নামের পরিবর্তে 'আল-আমীন' নামই বেশি পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেখা হলেই লোকেরা বলত, "এই যে আমাদের আল-আমীন আসছেন।" বস্তুত আল-আমীন উপাধি লাভের মধ্যে আমরা এ সত্যই উপলব্ধি করি, ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে বাল্যজীবনের চরিত্র মাধুর্যের ওপর। সত্যবাদিতা সে চরিত্র গঠনের প্রথম এবং প্রধান উপরকরণ।

হিল্‌ফুল্ ফুযুল গঠন

মহানবী (সা.)-এর জন্মের পূর্বে আরবে যেসব যুদ্ধ-সংঘাত একাধারে চলে আসছিল, তন্মধ্যে 'হারবুল ফিজ্জার' বা ফিজারের যুদ্ধই ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। কুরাইশ এবং কায়িস্ গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। উকায মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্য করে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এমন বিরতিহীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংসলীলা, প্রলয় তাণ্ডব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে মুক্তিদান ও সমাজে চুরি ডাকাতি, খুনাখুনি, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, রাহাজানি বন্ধে রাসূল (সা.) এক সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিরাজমান অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি একটা সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। রাসূল (সা.) ফেজারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃব্য ও গোত্রনেতা যোবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে হাশিম ও যুহরা প্রভৃতি বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ আবদুল্লাহ ইবনে জায়দানের গৃহে সমবেত হন এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ প্রতিজ্ঞার উদ্যোক্তাদের অনেকের নামের মধ্যে 'ফযল' ধাতু ছিল বিধায় প্রতিজ্ঞাটির নাম 'হিলফুল-ফুযুল' বা ফযলদের প্রতিজ্ঞা নামে খ্যাত হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
২. বিদেশী লোকদের ধনপ্রাণ ও মানসম্মান রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
৩. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করব।
৪. জনসাধারণকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যন্ত বেশ কাজ হয়েছিল। তবে কালক্রমে ইসলামের বিস্তৃতি হওয়ার পর কুরাইশ দলপতিরা এ প্রতিজ্ঞার শর্ত ও হলফনামার কথা ভুলে যান। সবচাইতে বড় কথা হলো, ইসলামের আগমনে তা ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। অন্যদিকে পৌত্তলিকরা রাসূল (সা.) বিরোধী ছিল বলে হিলফুল ফুযুলের প্রতিজ্ঞা আর কার্যকর থাকেনি।

বৈবাহিক জীবন

আল-আমীন চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে খাদিজা (রা:)-এর প্রতিনিধিরূপে সিরিয়ায় যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিল খাদিজা (রা:)এর বিশ্বস্ত কর্মচারী মায়সারা এবং একজন আত্মীয়। সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হয়ে আল আমিন মক্কায় ফিরে আসেন এবং হযরত খাদিজা (রা:)-কে হিসাবপত্র ও অর্থকড়ি বুঝিয়ে দেন। প্রচুর লাভ হওয়ায় খাদিজা (রা:) যুবক মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে উপযুক্ত পারিতোষিক দেন। ধীরে ধীরে আল-আমীনের প্রতি হযরত খাদিজা (রা:)-এর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় এবং সে শ্রদ্ধা অনুরাগে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব

করেন। তখন আল-আমীন মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ২৫ বছর আর হযরত খাদিজার ৪০ বছর। এ বয়সের একজন যুবকের পক্ষে এমন এক প্রৌঢ়া মহিলাকে বিয়ে করার বিষয়টি স্বাভাবিক ছিল না। চাচা আবু তালিবের অনুমতিক্রমে বিবি খাদিজা ও রাসূল (সা.)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তাঁদের এ দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়েছিল। হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোনো নারীকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেননি। খাদিজা বিয়ের পর পরই তাঁর সকল সম্পদ সম্পত্তি প্রিয় স্বামীকে দান করে দেন।

হাজ্‌রে আসওয়াদ পূনঃস্থাপন

কাবার স্থাপনা পাশ্ববর্তী পাহাড়ের তুলনায় নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকায় বর্ষার পানিতে স্রোত প্রবল বেগে তার মধ্যে প্রবেশ করে প্রায়ই ক্ষতিগ্রহস্ত হয়ে পড়ত। এ সমস্যার সমাধানকল্পে কাবার চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু একদা পানির স্রোতের বেগে তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য কাবা গৃহ নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কুরাইশ বংশের সকল গোত্রের লোকজন একত্রে মিলে-মিশে কাবা গৃহের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করে, কিন্তু 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' বা কালো পাথর কারা যথাস্থানে স্থাপন করবে, তা নিয়ে মহাবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। প্রস্তরখানি স্থাপনের সাথে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগত প্রাধান্যের সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকরাই দাবি করতে লাগল, আমরাই প্রস্তর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। প্রথমে বচসা, তারপর তুমুল দ্বন্দ্ব-কোলাহল আরম্ভ হয়। এ কোন্দল-কোলাহলে চার দিন কেটে গেল, কিন্তু মীমাংসার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহবান করে বললেন, "আমার প্রস্তাব হচ্ছে, যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করবে, তার ওপরই এ বিবাদ ফয়সালার ভার অর্পণ করা যাক। সে যে সিদ্ধান্ত করবে তাই আমরা মেনে নেব।" বৃদ্ধের এ সমীচীন প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হয়। পরদিন ভোরে দেখা গেল, মুহাম্মদ (সা.) সকলের আগে কাবাঘরে প্রবেশ করছেন। তখন সম্মিলিত কণ্ঠে আনন্দের রোল ওঠে- "এই তো আমাদের আল-আমীন। আমরা সকলেই তাঁর মীমাংসায় সম্মত আছি।" আল-আমীন তাদের মুখে সব ব্যাপার অবগত হয়ে একখানা চাদর বিছিয়ে নিজে প্রস্তরখানা তার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন এবং নির্বাচিত গোত্র প্রতিনিধিদের বললেন, "এবার আপনারা প্রত্যেকেই এ চাদরের এক এক প্রান্ত ধরে পাথরখানা যথাস্থানে নিয়ে চলুন।" সকলেই রাসূলের অনুসরণ করলেন। যথাস্থানে উপনীতি হয়ে মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় পাথরখানা নিজ হাতে তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করেন। এভাবে বিবাদমান গোত্রগুলোর মধ্যে এক জটিল সমস্যার ফয়সালা হয়ে গেল।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহ ব্যাপক সুনামের ফলে আল-আমীন একটি আসন্ন ভয়াবহ রক্তপাতের আশংকা থেকে আরব গোত্রগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী, এ সময় আল-আমীনের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহানবী (সা.)-এর জন্ম ও শৈশবকালীন ঘটনাসমূহ **চিহ্নিত** করুন।

বিশুদ্ধমতানুযায়ী মহানবী (সা.) এর জন্ম তারিখ কোন্‌টি?	আমূল ফিল কী?	কুরাইশ নামের উৎপত্তি কার নাম থেকে এসেছে?	হালিমা কে?

সারসংক্ষেপ :

আরবভূমিসহ সমগ্র পৃথিবীতে যখন মানবতার মর্যাদা ভুলণ্ঠিত হচ্ছিল, মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে শিরকসহ নানা মতবাদের প্রসার ঘটেছিল, ঠিক তখনিই অখিরী নবী হযরত মুহাম্ম (সা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বে পিতা এবং শৈশবে মাতৃবিয়োগের মাধ্যমে কঠিন বাস্তবতায় জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর স্বভাব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলির মাধ্যমে জাহিলী সমাজে আল আমিন নামে খ্যাতি লাভ করেন। নবুয়াত লাভের পূর্বেই হিল্‌ফুল্ ফুযুল সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এবং যুব বয়সে কাবা ঘরের কালো পাথর স্থাপনের সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের আনুষ্ঠানিক আস্থা অর্জন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ৫৭০ (খ) ৫৭৩
(গ) ৫৭৯ (ঘ) ৫৮২

২। 'আমুল-ফিল' বা হস্তিবর্ষ বলা হয় কোন খ্রিস্টাব্দকে?
(ক) ৫৭০ (খ) ৫৭৩
(গ) ৫৭৯ (ঘ) ৫৮২

৩। মহানবী (সা.)-কে 'আল-আমীন' বলা হয় কারণ তিনি-
(ক) আমানত রক্ষা ও সত্য বলতেন (খ) কর্তব্যনিষ্ঠায় অটুট ছিলেন
(গ) সৎ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন (ঘ) বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতেন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মসজিদের উন্নয়নে অশংগ্রহণ নিয়ে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বিরোধ বাধে। প্রতিটি পরিবার নিজেরাই সম্পূর্ণ খরচ দিবে বলে দাবি করে। তখন মসজিদের ইমাম সাহেব তাদের মধ্যে উন্নয়ন কাজে সমান অংশীদারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং পরবর্তীতে যেন গ্রামে এসব বিষয়ে অশান্তি না হয় সেজন্য কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

(ক) সিরিয়া ভ্রমনের সময় কিশোর মহানবী (স:) এর সাথে কোন খ্রীস্টান পাদ্রীর সাক্ষাত হয়? ১
(খ) হিলফুল ফুজুলের পরিচয় দিন। ২
(গ) বিরোধ নিস্পত্তিতে ইমাম সাহেব কোন ঘটনাকে অনুসরণ করেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) ইমাম সাহেবের পদক্ষেপ সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারে। আপনি কি এর সঙ্গে একমত? ৪

পাঠ-৩.২ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবী ও নবুয়াত সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ওয়াহী-এর পরিচয় জানতে পারবেন
- প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহী

	মুখ্য শব্দ	**নবুয়াত, ওয়াহী, জিব্রাইল,হিরা গুহা, বুহায়রা ও ওরাকা ইব্নে নওফল**

নবুয়তের পরিচয়

'নবুয়াত' শব্দটি আরবী 'নাবাআ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে-সংবাদ। সে হিসেবে নবী শব্দের অর্থ সংবাদ বাহক বা সংবাদ দাতা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির নিকট প্রয়োজনীয় খবরাখবর বা সংবাদ তথা আল্লাহর নির্দেশসমূহ পৌঁছে দেয়ার জন্য যারা সংবাদদাতার ভূমিকা পালন করেছেন, তারাই নবী। প্রত্যেক নবী রাসূলই মানবজাতিকে তাদের বিস্মৃত দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে দুনিয়াতে আগমন করেন। তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। শিরক্-বিদআাত থেকে তাদের দূরে রাখেন। তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ জাহিলী রসম-রেওয়াজ রহিত করেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করার পদ্ধতি শেখান। নির্ভূল ও সঠিক আইনের প্রচলন করে তা মেনে চলার নির্দেশ দেন।

ওয়াহী পরিচিতি

ওয়াহী অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, মনে কোনো কথা নিক্ষেপ করা, গোপনে কোনো কথা বা বাণী পাঠানো। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের নিকট যা প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেন তাকে অহী বলে। ওয়াহী দুই প্রকার, যথা: (ক) ওয়াহী মাতলু: যার শব্দ ও অর্থ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-অর্থাৎ কুরআন (খ) ওয়াহী গাইরি-মাতলু, যার ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে তবে ভাষা রাসূল (সা.)-এর, অর্থাৎ হাদীস। আদম (আ:) থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) সকল নবী-রাসূলগনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়াহী

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছিল, তখন মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাবের আবেশ আরো গভীর হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্ভৃত নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন থাকা তাঁর নিকট প্রিয় মনে হতে লাগল। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হিরা পর্বত, চারদিকে জনমানবহীন বিস্তৃত মরূপ্রান্তর। সে পাহাড়ের গুহায় তিনি মাসের পর মাস অবস্থান করে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন যখন তিনি পূর্বের অভ্যাসমতো হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন জিব্রাইল (আ) অহী নিয়ে এসে তাঁকে বললেন, "ইকরা (পড়ুন)। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। দ্বিতীয়বারেও একই নির্দেশে রাসুল (সা.) নেতিবাচক জবাব দেন। একইভাবে তৃতীয়বার বললেন, পড়ুন। তখন রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়তে হবে? বললেন: "পড়ুন, আপনার প্রভূর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ড থেকে। সে প্রভূর নামে পাঠ করুন, যিনি মহিমান্বিত; মানুষকে যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন।" (সূরা আলাক, ৯৬: ১-৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আমি তাঁর থেকে শুনে শুনে শব্দ ও বাক্যগুলো উচ্চারণ করলাম। তিনি প্রস্থান করলে আমি ধ্যান থেকে উঠে পাহাড়ের গুহা থেকে বর হয়ে আসলাম। যখন পাহাড়ের অর্ধ পথ নেমে এসেছি, তখন আকাশ থেকে কণ্ঠ' শ্রুত হলো- 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল। আমি মুহূর্তে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখলাম, আকাশ জুড়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন- আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল। তারপর স্বপ্নের দৃশ্যাবলীর মতো তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে আমার ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হৃৎকম্প শুরু হলো। আমি দ্রুত বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম।

বাড়ি ফিরে রাসূল (সা.) জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতো কাঁপতে লাগলেন এবং খাদিজাকে বললেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও।" যতক্ষণ না তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন, ততক্ষণ তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত রাখা হলো। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে রাসূল (সা.) হযরত খাদিজা (রা:) কে সার্বিক বিষয় ব্যক্ত করলেন। খাদিজা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: ভয়ের কারণ নেই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলবে না। কেননা আপনি সর্বদা মানুষের কল্যানে কাজ করেন, দু:খীদের সাহায্য করেন এবং তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবনে নওফলের নিকট গমন করেন। তিনি হিব্রু ভাষা জানতেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের পণ্ডিত ছিলেন। রাসূল (সা.) এর নিকট পূর্বাপর সকল ঘটনা শুনে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কুদ্দুসুন' (শুভ, শুভ)! তিনি 'নামুসুল আকবার (স্বর্গীয় বাণীবাহক জিবরাইল)। যিনি আপনার নিকট আগমন করেছিলেন, তিনি সেই দূত (ফিরিশ্‌তা), যিনি হযরত মূসা (আ) এর নিকট এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এভাবেই চল্লিশ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমযান কদরের রাতে নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়তপ্রাপ্তির এ ঘটনা হাদীসে একাধিক জায়গায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার ওহী

আল্লামা ইবনে কাইয়িম নিম্নোক্ত কয়েক প্রাকারের ওয়াহীর কথা উল্লেখ করেছেন-

১. সত্য স্বপ্ন। স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর ওপর ওয়াহী নাযিল হতো।
২. ফেরেশতা তাঁকে দেখা না দিয়ে তাঁর মনে কথা বসিয়ে দিতেন। যেমন প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, রুহুল কুদ্দুস আমার মনে একথা বসিয়ে দিলেন, কোনো মানুষ তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালো জিনিস তালাশ করো। রিযিক পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে রিযিক তালাশ করো না। কেননা, আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া যায় না।
৩. ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওয়াহী নিয়ে আসতেন
৪. রাসূল (সা.)-এর কাছে ওয়াহী ঘণ্টাধ্বনির মতো টন টন শব্দে আসতো। এটি ছিল ওয়াহীর সবচেয়ে কঠোর অবস্থা। এ অবস্থায় ফেরেশতা তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং প্রচণ্ড শীতের মওসুম হলেও প্রিয়নবী (সা.) ঘর্মাক্ত হতেন। তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো।
৫. মহানবী (সা.) ফেরেশতাদের তাঁর প্রকৃত চেহারায় দেখতেন। সেই অবস্থাই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিল হতো।
৬. ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা। প্রিয় নবীর সাথে আল্লাহর কথা বলার প্রমাণ মিরাজের ঘটনায় রয়েছে।

এভাবে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী অবতীর্ণের মাধ্যমে মহানবী (সা.) নবী ও রাসূল হিসেবে আবির্ভুত হলেন। তার উপর অহী প্রচারের দায়িত্ব বর্তায়। মহানবী (সা.) এর দাওয়াতী কর্মকাণ্ডসমূহ তার জীবনের মতই সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়-প্রথমত: মক্কা জীবন, এসময়টি ৬১০ সাল থেকে ৬২২ সন পর্যন্ত মোট ১৩ বছর। দ্বিতীয়ত: মদীনা জীবন, এ সময়টি ৬২২ থেকে ৬৩২ সন পর্যন্ত মোট ১০ বছর।

মহানবী (সা.)-এর নবুয়াতী ২৩ বছরে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবানের তিনটি পর্যায় উল্লেখযোগ্য যথা:

১. গোপনে ইসলাম প্রচার: অহী নাযিলের পর থেকে প্রথম তিন বছর।
২. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার: নবুয়াতের চতুর্থ বছর থেকে দশম সন পর্যন্ত।
৩. মক্কার বাইরে আরব ও সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার: নবুয়াতের দশম বছর থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) এর ওফাতকাল পর্যন্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়াহী সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করুন।

ওয়াহী কী?	ওয়াহী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কার উপর অবতীর্ণ হয়?	ওয়াহী কত প্রকার ও কী কী?	প্রথম ওয়াহী কোনটি?

সারসংক্ষেপ :

৪০ বছর বয়সে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন। বিপদগামী মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল করা হয় আল কুরআন। হেরা গুহায় নাযিলকৃত কুরআনের প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'ইকরা' বা পড়। ৬১০ থেকে ৬৩২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী নাযিলকৃত কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র অনুকরনীয় আদর্শ। কেয়ামাত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য পথ চলার পাথেয়। মানব জীবনের সকল সমস্যা ও জিজ্ঞাসার জবাব আল কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভে মানব জীবন ধন্য হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রথম অবতীর্ণ অহীর শব্দ কোনটি?

(ক) ইকরা (খ) ইখ্‌ফা

(গ) ইল্‌হাম্‌ (ঘ) কিরাঅ

২। ওয়াহী নিয়ে আসেন কোন্‌ ফিরিশ্‌তা?

(ক) মিকাইল (খ) জিব্রাইল

(গ) ইস্রাফিল (ঘ) আজরাইল

৩। প্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সূরা কোনটি?

(ক) ফাতিহা (খ) ইখলাস

(গ) আলাক (ঘ) আনফাল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অধ্যাপক মো: আবুল কালাম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প শোনান। সেন্টমার্টিন দ্বীপের পথহারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে একদা একজন বিখ্যাত লোকের আবির্ভার ঘটে। তিনি দ্বীপ বাসীর জন্য নতুন বার্তা নিয়ে এলেন। মানুষের উপর অর্পিত সৃষ্টি কর্তার দেয়া দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন। প্রচলিত বিশ্বাসের পরিবর্তে নতুন বাণীতে মানুষ অভিভূত হয়। ক্রমেই দ্বীপঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী সে আহবান ছড়িয়ে পড়ে।

(ক) ওয়াহী অর্থ কী? ১

(খ) ওয়াহী- এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। ২

(গ) ওয়াহী নাযিলের ধাপগুলো বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ঘটনার সাথে মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৩.৩ মক্কায় ইসলাম প্রচার ও কাফিরদের বিরোধিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) কর্তৃক ইসলামের প্রচারের সূচনা কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের পরিচয় জানতে পারবেন ও
- ইসলামের বিরুদ্ধে কোরাইশ কাফিরদের ষড়যন্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

	মুখ্য শব্দ	**দ্বীনের দাওয়াত, গোপনে দ্বাওয়াত, প্রকাশ্যে দাওয়াত ও পৌত্তলিকতা**

ইসলামের দাওয়াত

নবী রাসূলদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত। আর তাই দাওয়াত মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিশন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এভাবেই মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। তিনি সত্য প্রচারে আদিষ্ট হলেন, "হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনার প্রভু আপনাকে যে সত্য দান করেছেন, তা প্রচার করুন।" (সূরা মায়িদা-৬৭)। তখন থেকে রাসূল (সা.) সত্য প্রচারে ব্রতী হন।

গোপনে ইসলাম প্রচার

প্রথম তিন বছর গোপনে প্রচার কার্য চালান। সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহধর্মিণী খাদিজা (রা:), তারপর পিতৃব্য পুত্র আলী (রা:), মুক্ত দাস যায়িদ বিন হারিসা ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রা:)। আবু বকর সিদ্দীক (রা:) ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই বন্ধুবান্ধব ও সমমনাদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করে দেন। অচিরেই হযরত উসমান, আবদুর রহমান, সাদ, যোবায়ের, তালহা (রা:) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আবু ওবায়দা, আবু সালামা, উসমান ইবনে মাযউন, সাঈদ ইবনে যায়িদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখও হযরত আবু বকর (রা:)-এর আহ্বানে ইসলামে দীক্ষিত হন। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম তিন-চার বছর পর্যন্ত উপরিউক্ত মনীষীদের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরাই ছিলেন রাসূলের প্রাথমিক সহচর। রাসূলের সুখে-দুঃখে তাঁরাই ছিলেন নিত্যসঙ্গী, সমব্যথী।

প্রকাশ্যে প্রচারের আদেশ

গোপন প্রচারের প্রথম তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চতুর্থ বছরের প্রারম্ভেই প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ হয়- "আপনি আদিষ্ট বিষয় (আল্লাহ তায়ালার বাণী) প্রকাশ্যভাবে শুনিয়ে দিন।" (হিজর-৯৪) "আপনি আপনার পরিবার পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের (আল্লাহ তায়ালার) ভয় প্রদর্শন করুন।" (শুআরা- ২৯৪)

যেমন নির্দেশ তেমন কাজ। এ নির্দেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার অদূরবর্তী সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং গোত্রপতিদের সবাইকে আহবান করে পর্বতের পাদদেশে জমায়েত করেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "হে কুরাইশ! আজ যদি আমি বলি, এ সাফা পর্বতের পশ্চাতে একদল প্রবল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষমান, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?" সবাই জবাব দিল, "নিশ্চয়ই করব, কারণ এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনো দিন মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তিনি বললেন, "আমি এখন তোমাদের বলছি, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে।" রাসূলের দাওয়াতী বাণী শ্রবণ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। এদের মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও উপস্থিত ছিল।

এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) মনোবল চ্যুত হলেন না। নিরাশাও তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। এবার তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করে আবদুল মুত্তালিবের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব হযরত আলী (রা:)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। সকলেই ভোজসভায় উপস্থিত হয়। আহারান্তে তিনি ইসলামের কথা শুরু কররে সকলে হৈহুল্লোড় করে চলে যায়। কিছুদিন পর তিনি

আরেক ভোজসভার আয়োজন করেন। এবার তিনি আহারের পূর্বেই বক্তব্য শুরু করেন। সম্ভবত খাবার গ্রহণের পূর্বে বিশেষ কারণে শ্রোতারা চুপ থাকে। তাই সামনে নিয়ে সকল শ্রোতা চুপ করে বসে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "হে বনু মুত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই তার কওমের জন্য আনতে পারেনি। আমি তোমাদের আল্লাহর দিকে আহবান করছি। তোমরা যদি আমার ডাকে সাড়া দাও, তবে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য তোমাদের দখলে আসবে। এবার বল, এ কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে?" সমগ্র ভোজসভা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ আলী (রা:) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি আপনাকে সাহায্য করব। এভাবে সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম বেড়েই চলল। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ

ইসলাম হলো সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও একত্ববাদের ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ সত্য সুন্দরের আহবান কুসংস্কারাচ্ছন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশরা মেনে নিতে পারল না। তারা ইসলাম প্রচারে তীব্র বাধার সৃষ্টি করল। তাদের এ বিরোধিতার পেছনে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। যার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

১. **ধর্মীয় কারণ :** ইসলাম ধর্ম কবুল করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে সকল প্রকারের শিরক হতে মুক্ত করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে আরববাসীকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন, তখন মূর্তিপূজক কুরাইশ সম্প্রদায় তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে।

২. **সামাজিক কারণ :** সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হলো ধনী-নির্ধন, উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, সাদা-কালো সকলেই সমান। মুহাম্মদ (সা.) আরবে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সমাজে বিরাজিত অত্যাচার-অনাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, নরবলী, মদ্যপান, জুয়া খেলা, কুসিদ প্রথা, লুণ্ঠন ইত্যাদি পাপাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আরবরা তাই নবী (সা.)-এর বিরোধিতা করতো।

৩. **রাজনৈতিক কারণ :** কাবার বদৌলতে সমগ্র আরবের নেতৃত্ব কুরাইশদের কুক্ষিগত ছিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগের সাথে লক্ষ করল এভাবে ইসলামের শক্তি উত্থিত হলে, তাদের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। তাই উপায়ন্তর না দেখে তারা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

৪. **অর্থনৈতিক কারণ :** কুরাইশরা হজ্জের মওসুমে অনেক প্রকার আর্থিক সুবিধা ভোগ করতো। যদি মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসে একমত হয়ে মানুষ একত্ববাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে পৌত্তলিকদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য তারা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধিতা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মক্কায় ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর প্রথমিক পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করুন।**

কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?	গোপনে ইসলাম প্রচারের সময় ৩ জন মুসলিমের নাম লিখুন।	কোন সালে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়।?	মানবী (সা.) কোন পাহাড়ের পাদদেশে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন?

সারসংক্ষেপ :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে গোটা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর প্রচারিত সত্য ধর্মেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও তাঁকে এতটুকু দমিয়ে দিতে পারেনি; বরং ক্রমশ ইসলামের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি বেড়েই চলেছে। অবশেষে কুরাইশদের বাধাসহ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ আরবসহ সমগ্র পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত সনে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন?

(ক) ৬১১ (খ) ৬১২

(গ) ৬১৩ (ঘ) ৬১৪

২। সর্বপ্রথম কুরআনের যে কথা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়-

(ক) পড়ুন, আপনার রবের নামে (খ) লিখুন, আপনার প্রভুর নামে

(গ) বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (ঘ) লিখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই

৩। ওয়াহী অবতরণের অলৌকিক ঘটনা অবগত হয়ে হযরত খাদীজা (রা:) রাসূল (সা.)-কে প্রদান করেন-

i. সাহস ii. সহযোগিতা iii. উৎসাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জনাব জামিল সাহেব বিশ্রাম নগর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক। গ্রামের মানুষ তাকে খুবই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে এবং যেকোনো পরামর্শের জন্য তার কাছে আসে। মাতবর শ্রেণির কিছু লোকজন গ্রামে মেলার নামে অশ্লীল নাচগানসহ, মদ-জুয়ার আসর বসায় বিভিন্ন অনৈতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ নষ্ট হয়। এই অবস্থায় আতিক সাহেব এগুলো বন্ধের আহ্বান জানালে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি তার উপর অমানবিক নিপীড়ন শুরু হয়।

(ক) নবী করীম (স) কত বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন? ১

(খ) কুরাইশদের ইসলামের বিরোধিতা করার কারণ কী? ২

(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে নবী করীম (স)-এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ৩

(ঘ) উক্ত ঘটনা মহানবী (স) কিভাবে মোকাবেলা করেন? ৪

পাঠ-৩.৪ ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের নির্যাতন ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে কুরাইশদের বিরোধিতার ঘটনাবলী জানতে পারবেন এবং
- মুসলমানদের উপর কাফিরদের নানারকম নির্যাতনের বিষয় জানতে পারবেন

	মুখ্য শব্দ	**আবু তালিব, আস ইবনে হিশাম, আওয়াদ ও আবুল হাকাম**

কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতন

মক্কার কুরাইশরা ছিল কাবার তত্ত্বাবধায়ক। কাবাকে কেন্দ্র করে তাদের গড়ে উঠেছিল বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। পৌত্তলিকতার সাথে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থ উপার্জনের বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত একত্ববাদের ধর্ম ইসলামকে মেনে নিতে পারল না। তারা নতুন জীবনব্যবস্থা প্রচারকে একটা মহা ধৃষ্টতা বলে মনে করতে থাকে। ইসলামের প্রসারকে রুখতে নানা রকমের অত্যাচার শুরু করে।

আবু তালিবের সমর্থন

কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হলে চাচা আবু তালেব রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণ করেন। আবু তালেব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করেও মহানবী (সা.)-কে সর্বতভাবে সমর্থন করেন, এজন্য কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারেনি।

আবু তালেবের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধিদল

মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনড় অবস্থান আর কঠিন সিদ্ধান্ত আঁচ করতে পেরে কুরাইশ নেতারা আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। কুরাইশরা যখন দেখল তাদের অসন্তুষ্টিতে মুহাম্মদ(সা.)-এর কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, অন্যদিকে আবু তালেবও তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, সর্বশেষ তারা পরামর্শক্রমে একত্র হয়ে আবু তালেবের কাছে একে একে তিনবার প্রতিনিধি দল পাঠায়।

(১) প্রথম প্রতিনিধি দলে বিখ্যাত কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ছিল উত্বা, শাইবা, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আস ইবনে হিশাম, আওয়াদ, আবুল হাকাম প্রমুখ। তারা বলে, হে আবু তালেব! তোমার ভ্রাতুস্পুত্র আমাদের মাবুদদের গালি দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রষ্ট বলছে। এখন তুমি তাকে এসব থেকে বারণ কর, অথবা তার প্রতি সমর্থন পরিহার কর। অন্যথায় আমরা এ ব্যাপারে যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দ্বিধা করব না। আবু তালিব অযথা বাকবিতণ্ডা না করে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কোমল ভাবে বুঝিয়ে তাদের বিদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যথারীতি ইসলামের প্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকলেন।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের নিকট গমণ করে বলল, 'হে আবু তালিব! বয়সে আপনি আমাদের চেয়ে বড়, সম্মান-মর্যাদায়ও উচ্চ, আমরা অনুরোধ করেছিলাম আপনি আপনার ভাতিজাকে আমাদের দেবমূর্তিদের বিরুদ্ধে বলা থেকে বারণ করবেন, কিন্তু আপনি তা করেননি। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনার মাধ্যমে আমরা মুহাম্মদ (সা.) কে শেষবারের মতো সুযোগ দিয়ে আমরা আপনাকে সাবধান করছি। এতে যদি কাজ না হয়, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাব। এতদূর গড়াতে দেখে আবু তালিবও আর বিষয়টা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এতে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন, তাঁর জন্য সমস্যা ছিল তিনি সরাসরি ইসলামও গ্রহণ করতে চাননি; আর রাসূললুল্লাহ (সা.) নিহত বা অপদস্থ হোক তাও চাননি। তিনি এমনি চিন্তিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে বললেন- "ভাতিজা, তোমার স্বজাতি একত্র হয়ে আমার নিকট এসেছিল। তারা আমার সাথে কথাবার্তা বলেছে। তুমি আমার এবং তোমার নিজের ওপর করুণা কর। আমার ওপর এমন বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করতে আমি অসমর্থ।"

চাচার কথায় মহানবী (সা.) বললেন-"চাচা! আল্লাহর কসম, আমি যা কিছু করছি তা সবই আল্লাহর আদেশমাত্র। যদি এসব লোক আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তাহলেও আমি এ মহাসত্যের প্রচার ও নিজের কর্তব্য থেকে বিরত হতে পারব না। হয় আল্লাহ একে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু চাচা! মনে রাখবেন মুহাম্মদ কখনই নিজের কর্তব্য থেকে বিরত হবে না।" একথা শুনে আবু তালিবের অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। তাঁর মনমানসিকতায় এ দৃঢ় উক্তির বিরাট প্রভাব পড়ে। তিনি বললেন, "ভাতিজা! তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত; তুমি তোমার কাজ করে যাও। তোমার ব্যাপারে তাদের সাথে আমার কোনো আপস হবে না; হতে পারে না।"

(৩) একপর্যায়ে কাফিররা যখন নিশ্চিত হয়ে গেল, আবু তালেবের কোনো অবস্থায়ই রাসূললুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করবেন না এবং তাঁর জন্য সমগ্র জাতির বিরোধিতা ও শত্রুতার তোয়াক্কা করেন না, তখন তারা আম্মারা ইবনে ওয়ালিদকে নিয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়ে বলল, "আপনি তো আপনার ভাতিজার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। এখন আমরা আপনার নিকট আম্মার ইবনে ওয়ালিদকে নিয়ে এসেছি। সে কুরাইশদের মধ্যে অত্যধিক জ্ঞানী। তাকে আপনি আপনার ভাতিজার পরিবর্তে নিয়ে নিন, আর মুহাম্মদকে আমাদের হস্তে সমর্পনণ করুন।" এবারও আবু তালেব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন

মুসলিমদের উপর নির্যাতন

প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্যবস্তু করা সমীচীন হবে না ভেবে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ করে। হযরত ওসমান (রা:)-কে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। যুাবাইর ইবনুল আওয়ামকে চাটাইতে মুড়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রদান করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কাবা প্রাঙ্গণে অমানুষিক মারপিট করা হয়। সবচেয়ে অধিক অত্যাচারিত সে সকল ভাগ্যাহত দাস-দাসীরা, যারা মুসলমান হয়েছিল। নিষ্ঠুর উমাইয়া ইবনে খালফ বিলাল (রা:)-এর গর্দানে রশি লাগিয়ে দুষ্ট বালকদের হাতে সোপর্দ করতো। তারা তাঁকে অলি-গলিতে টেনে ফিরত। গ্রীষ্মেও প্রচণ্ড উত্তাপে উমাইয়া তাঁকে মক্কার বাইরে নিয়ে যেত এবং তাঁর শরীর থেকে কাপড় খুলে দুপুরের তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিত। বেলাল (রা:) এ অবস্থায় কেল 'আহাদ আহাদ' বা "আল্লাহ এক, আল্লাহ এক" শব্দই উচ্চারণ করতেন।

উম্মে নুমার নাম্নী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন হযরত খাব্বাব (রা:)। জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়ার ফলে তাঁর চামড়া গলে চর্বি বের হয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। এমন অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচারেও তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতেন না; বরং মুখে 'আহাদ' নাম জপ করেই যেতেন। এতে তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হতো।

আম্মার ইবনে ইয়াসারকেও মরুর তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখা হত। কুরাইশরা তাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলত। তাকে পানিতে চুবানো হতো এবং জ্বলন্ত অংগারের উপর শোয়ানো হতো। আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া (রা:)-কে ইসলাম গ্রহনের অপরাধে পাপিষ্ঠ আবু জাহল বর্শার আঘাতে পাশবিক পন্থায় হত্যা করে। ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের হাতে মুসলমানদের এটিই শাহাদাতের প্রথম ঘটনা। আম্মারের বাবা ইয়াসার (রা:)ও কাফিরদের নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়াও আবুযর গিফারী, উম্মে শুরাইক, উসমান ইবনে মাযউন,আবু যর, সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, লুবাইনা, যুনাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:)-প্রমূখ সাহাবীদের উপর নানা রকমের নির্যাতন করা হয়।

অন্যদিকে অত্যাচারের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। নারকীয় এসব অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাসূল (সা.)-এর মন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনিও কাফিরদের থেকে রেহাই পাননি। তাঁকে অহরহ যাদুকর, পাগল, কবি ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতো, নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। তাঁর যাতায়াত পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, কাবা শরীফে সিজদারত অবস্থায় একদা আবু জাহল উটের নাড়িভূড়ি তাঁর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। তাঁকে অশালীন ভাষায় গালমন্দও করতো।

প্রস্তাব-প্রলোভন

শত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন দেখে কুরাইশ কাফিররা সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট চতুর ব্যক্তি উত্বা ইবনে রাবিয়াকে এক প্রলোভনের প্রস্তাব দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। সে এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! তুমি কি মক্কার রাজত্ব চাও? না কোনো বড় বংশে বিয়ে? নাকি বিপুল সম্পদরাজি? তার সবকিছুই আমরা তোমার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার কাছে আমাদের একটিমাত্র আবদার, তুমি বর্তমানে যা করছ, তা থেকে বিরত

থাকবে।" প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) সূরা 'হা-মীম-সাজদা'-এর কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেন। ওতবা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেগুলো শুনতে থাকে। তাতে তার চোখে-মুখে প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফুটে ওঠে। সে গিয়ে কুরাইশদের বলে, "মুহাম্মদ যা বলে তা যাদুও নয়, কাব্যও নয়, তা অন্য কিছু। এ চেয়ে উত্তম কথা আমার কান আর কখনো শুনেনি। আমার মতে, তোমরা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। যদি সে বিজয়ী হয়, তাহলে তোমাদেরই নাম; আর যদি আরবরা জয় লাভ করে তাতেও তোমাদের গৌরব" কুরাইশরা উতবার কাছ থেকে এ ধরনের পরামর্শ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না; এতে তারা উতবার ওপর সন্দেহসূচক দৃষ্টি নিবদ্ধ কর তাকে যাদুর প্রভাবে ঘায়েল করা হয়েছে বলে অপবাদ প্রদান করে।

বয়কট

কুরাইশ কাফিররা নির্যাতনের সকল পন্থা চালিয়েও যখন ইসলামের প্রসারকে নিবৃত্ত রাখতে পারলনা, তখন তারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আঁটে। নবুয়াতের সপ্তম বর্ষের মুহাররাম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহানবীর বংশীয় গোত্র বনু হাশিম-কে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যে, বনু হাশিম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ(সা.)-কে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে এবং তাকে হত্যার অধিকার না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য গোত্রগুলো তাদের সাথে কোন আত্নীয়তার সম্পর্ক রাখবেনা, বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক রাখবেনা, লেন-দেন ও মেলা-মেশা করবেনা, কোন খাদ্য এবং পানীয়ও তাদের কোছে পৌঁছাতে দেবে না। শিয়াবে আবু তালেবে এ চুক্তির কারণে বনু হাশিম গোত্র দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত প্রায় বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করেছিল। ক্ষুধা ও পিপাসায় বনু হাশিম ও মুসলমানরা অমানবিক কষ্ট ভোগ করেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে হিশাম বিন আমর, যুহাইর ইবনে উমাইয়া, মুতয়াম ইবনে আদি, আবুল বুখতারী ও যাময়া বিন আসওয়াদ প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এ চুক্তি বাতিল করা হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহানবী (সা.) মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন। নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে **১১** জন পুরুষ ও চার জন নারী উসমান ইবনে আফ্ফানের নেতৃত্বে প্রথম হিজরত করে। উসমান (রা:) এর সাথে তদীয় স্ত্রী রাসূল তনয়া রুকাইয়াও গমন করেন। এর কিছুদিন পর ৮৫ জন পুরুষ ও **১৭** জন নারীর আরেকটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। পৌত্তলিক কুরাইশ কাফিররা আব্দুল্লাই ইবনে রাবীয়া ও আমর ইবনুল আসকে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর দরবারে দূত হিসেবে পাঠায়, যাতে তারা মুসলমানদের সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

ইসলামের প্রচার-প্রসারে কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ত্যাগ ছিল মহানবী (সা.)-এর একমাত্র সম্বল। সত্যের মহাসেবক, কর্তব্যের মহাসাধক মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আত্মবিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের পূর্ণতর আদর্শ। মানুষের উপেক্ষা ও হয়রানিতে তিনি কখনো হতোদ্যম হননি, আর না তাদের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়েছেন; বরং এতে তাঁর কাজের প্রতি আগ্রহ আরো বহু গুণ বেড়ে গেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলমানদের উপর কুরাইশ কাফিরদের অত্যাচারের একটি চিত্র অংকন কর।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ কে ?	মুসলমানরা প্রথম কোন দেশে হিজরত করেছিল?	কোথায় বনু হাশিমকে বন্দী করে রাখা হয় ?	প্রথম হিজরতকারী দম্পতি কোন্‌টি?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) নবুয়াত লাভের পর মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এতে অনেকেই উসলাম গ্রহণ করে। কাফিররা তাদের বিদ্যমান কতৃত্ব ও নেতৃত্ব বিলুপ্তির আশংকায় মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। স্বয়ং মহানবী (সা.)-সহ সাধারণ মুসলিমদের উপর নানারকম নির্যাতন শুরু হয়। সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হন সমাজের দুর্বল শ্রেনীর পেশাজীবিরা। হযরত বিলাল. খাব্বাব, আম্মার, সুমাইয়াসহ প্রথমদিককার মুসলিমরা কাফিরদের নির্যাতনে নিস্পেষিত হন। তথাপি একজন মুসলিমও ইসলাম ত্যাগ করেননি। দৃঢ় মনোবল, মজবুত ঈমান ও অক্লান্ত ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা ইসলামের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কুরাইশদরে অত্যাচার থেকে শিষ্যদের বাঁচানোর জন্য রাসূল (সা.) প্রথম রাজনৈতিক আশ্রয়ের হিজরত করতে বলেন-

(ক) আবিসিনিয়ায় (খ) সিরিয়ায়

(গ) জেরুজালেম (ঘ) মদিনায়

২। নাজাশী কোন্ দেশের বাদশাহ ছিলেন?

(ক) সিরিয়া (খ) মিসর

(গ) ইয়েমেন (ঘ) আবিসিনিয়া

৩। "আমুল হুযন" অর্থ কী?

(ক) দুঃখের বছর (খ) অশান্তি

(গ) দুঃসময় (ঘ) অসুস্থতাকাল

৪। কুরাইশরা মহানবি (সা.) ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে তিন বছর পর্যন্ত কোথায় বন্দি অবস্থায় রেখেছিল।

(ক) শিয়াবে আব্দুল মুত্তালিব (খ) শিয়া উপত্যকা

(গ) শিয়াবে আবু তালিব (ঘ) তায়েফ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজী এম ফজলুল কারীম সমাজের লোকদের দ্বীনের পথে চলার পরামর্শ দেন। প্রভাবশালীদের মহল তার এ দাওয়াতকে ভালো চোখে দেখেনি। তারা তার শত্রু হলো। এক পর্যায়ে সমাজপতিরা কাজীর পরিবারের সকল লোককে একঘরে করে রাখলেন। তারা হাট-বাজার থেকে কোনো খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারতো না। ফলে সেখানে তারা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে লাগলো।

(ক) মহানবী (সা.) কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন? ১

(খ) তায়েফবাসীদের বিরোধিতার অন্যতম একটি কারণ- ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) ফজলুল কারীম সাহেবের ঘটনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ফজলুল কারীম সাহেবের পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

পাঠ-৩.৫ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মিরাজ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.)-এর মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মিরাজের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মিরাজ, রজব মাস, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা**

মিরাজুন্নবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার ইচ্ছায় দ্বীনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সারওয়ারে কায়িনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মর্ত্যজগৎ রেখে অসীম স্বর্গজগৎ, সাত আসমান, বায়তুল মামুরসহ সৃষ্টি রহস্য অবলোকন ও উপলব্ধি এবং বেহেশত, দোযখ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যানে আরোহিত হয়ে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং বান্দার জন্য অশেষ নেয়ামতসহ একাধিক ফরমান মর্ত্যের ধরায় নিয়ে ফিরে আসেন। বিশ্ব মানবকুলকে অবাক করে নবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে সক্ষম, সিরাতে রাসূল (সা.)-এর এ মহান ঘটনাকে মিরাজুন্নবী (সা.) বলে অভিহিত করা হয়।

মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময়

নবুয়তের দশম বর্ষে মহানবী (সা.)-এর ৫০ বছর বয়সে রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়। আবার কেউ কেউ মিরাজের সময়কাল নবুয়তের একাদশ সন বলেও উল্লেখ করেন। সূরা বনি ইসরাঈলের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "মহিমান্বিত সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্যতম সময়ের মধ্যে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারদিককে আমি বরকতময় করেছি; যেন আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি অধিক শ্রবণকারী ও অধিক জ্ঞানি।" (বনী ইসরাঈল-১) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক রাতে কাবা চত্বরে যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে ঘুমিয়েছিলেন। এ সময় তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছেন। জেগে দেখলেন জিবরাঈল (আ) তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান, অদূরে 'বুরাক' নামক এক আজব বাহন অপেক্ষা করছে।

মিরাজের ঘটনাবলি

রাসূল (স.) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৫২ বছর। তিনি কা'বা শরীফের পার্শ্বে ঘুমিয়ে ছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) হঠাৎ তাঁকে জাগিয়ে তোলেন। তারপর তাঁর কাছে একটি পশু আনা হয়, যার রং সাদা এবং উচ্চতা খচ্চরের চাইতে একটু ছোট। এটি আলোর গতি সম্পন্ন ছিল বলে একে 'বুরাক' নামকরণ করা হয়। বুরাক শব্দের অর্থ 'বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন'। মহানবী (সা.) যখন বুরাকের ওপর আরোহণ করতে গেলেন, তখন তা নিজেকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করে তাঁকে সওয়া হতে বাধা দেয়। কিন্তু পরে হযরত জিব্রাইল (আ.) বুরাককে কষে ধরে বলেন, সাবধান ইতঃপূর্বে মহানবী (সা.) এর চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষ তোমার ওপর আরোহণ করেনি। মহানবী (সা.) তাতে আরোহণ করেন এবং হযরত জিব্রাইল (আ.) এর সাথে একসঙ্গে সফর আরম্ভ করেন।

মদিনায় তাঁরা প্রথম যাত্রা বিরতি করেন এবং সালাত আদায় করেন। জিব্রাইল (আ) বলেন, এটা আপনার হিজরতের স্থান। মক্কা ত্যাগ করে পরে আপনাকে মদিনায় আসতে হবে। দ্বিতীয় বার যাত্রা বিরতি করেন সিনাই পাহাড়ে। মুসা (আ) আল্লাহর সাথে এই পাহাড়ে কথা বলেছেন। তৃতীয় বার যাত্রাবিরতি করেন হযরত ঈসা (আ) এর জন্মস্থান পশ্চিম জেরুসালেম বেথেলহেম। বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছার পর তিনি বুরাককে মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের সাথে বাঁধেন। সেই দেয়ালের নাম হচ্ছে হায়েত আল-বুরাক বা বুরাক দেয়াল। তাঁর আগের নবীও এই একই দেয়ালে সাওয়ারী বেঁধেছিলেন। যখন তিনি সুলাইমান (আ.)-এর তৈরি মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেন। তখন পৃথিবীর শুরু থেকে ঐ

পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীকে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে সবাই জামায়াতে সালাত আদায় করেন। কে ইমামত করে তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা.)-কে হাত ধরে সামনে ইমামতের জন্য এগিয়ে দেন। তিনি সবাইকে নিয়ে সালাত পড়েন।

সপ্তম আসমানে তিনি বিরাট এক প্রাসাদ এবং বায়তুল মামুর দেখতে পান। বায়তুল মামুরের চারদিকে অসংখ্য ফেরেশতা তাওয়াফ করছে। বিরাট প্রাসাদের কাছে তিনি নিজের মতো এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তারপর তাঁকে আরো ওপরে নেয়া হয়। তিনি 'সিদরাতুল মুন্তাহা' নামক স্থানে পৌঁছেন। এই স্থানটিকে আল্লাহর আরশ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি শূন্য এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাসূল (সা.) লক্ষ্য করলেন, তাঁর সাথে আগত ফেরেশতারা এই পর্যন্ত পৌঁছে প্রয়োজনীয় বার্তা নিয়ে আসেন। এর ওপরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এ স্থানেই রাসূল (সা.)-কে নেক লোকদের উদ্দেশ্যে তৈরি বেহেশত ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেখানো হয়। ঐ বেহেশতী নেয়ামত সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কেউ কানে শুনেনি এবং চোখেও দেখেনি। এ স্থানেই হযরত জিবরাঈল (আ) থেকে গেলেন। এবার রাসূল (সা.) একাকীই সামনে অগ্রসর হওয়ার পালা। যখন তিনি একটি উঁচু সমতল স্তরে পৌঁছেন তখন তিনি নিজেকে মহান আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের দরবারে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁকে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়। এ রাতেই ৫ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক করা হয়।

সকাল বেলা উপস্থিত লোকদেরকে রাসূল (সা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। মুখে মুখে রাসূল (সা.)-এর মিরাজের ঘটনা চারদিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু লোক হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কাছে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা জানতে চায়। তাদের আশা ছিল হযরত আবু বকর (রা:) যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ইসলামী আন্দোলন মক্কা থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে। হযরত আবু বকর (রা:) পুরো ঘটনা শোনার পর মন্তব্য করেন, যদি রাসূল (সা.) বলে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই সত্য হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি প্রতিদিনই তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমন ও আল্লাহর বার্তা নাযিলের খবর শুনি এবং তা বিশ্বাস করি। সে দিনই হযরত আবু বকর (রা:) 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) খেতাবে ভূষিত হন।

কাফিরদের প্রতিক্রিয়া

এ ঘটনা প্রকাশ হলে কাফিররা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিহিত করে। তাদের মধ্যে থেকে যারা বায়তুল মাকদাস ভ্রমণ করেছিল তারা পরীক্ষামূলক অনেক প্রশ্ন করে, মহানবী (সা.) ঠিক ঠিকভাবে সে সব প্রশ্নের জবাব দেন। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল, পথে আমাদের বাণিজ্য বহর রয়েছে তা কোথায়, কখন আসবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফিরদের এ প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দেন, কিন্তু এরপরও তাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রবণতা কমেনি।

মিরাজ কী সশরীরে অনুষ্ঠিত হয়

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মিরাজ শারীরিকভাবে ঘটেছিল। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে, এ উপলব্ধি আধ্যাত্মিকভাবে ঘটেছিল। কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ মিরাজ বা নভোভ্রমণ শারীরিকভাবেই ঘটেছিল। তিনি সচেতন অবস্থায় সশরীরই আকাশ ভ্রমণ করেছিলেন।

গুরুত্বের বিচারে মিরাজ

মিরাজ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াতী যিন্দেগির এক আত্মোপলব্ধি। কেবল সীমার মধ্যে বসে আমরা যেমন অসীমকে সত্য করে চিনতে পারি না, শুধু অসীমের মধ্যে থেকেও সেরূপ সসীমকে চেনা যায় না। স্রষ্টাকে চেনার জন্য তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সৃষ্টিতে আসতে হয়েছিল; আবার সৃষ্টিকে চেনার জন্য তাঁকে স্রষ্টার কাছে যেতে হয়েছিল। এ জন্যই সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। এটাই মিরাজের তাৎপর্য। অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমাজ, রাষ্ট্রে Secrecy ও Privacy বলতে কিছু বিষয় থাকে, যা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। মিরাজের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সেখানেই।

মিরাজের সার্থকতা বিচার

মিরাজের সার্থকতা কী? কেউ হয় তো এ প্রশ্নও করতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাকেই বলে যার পূর্ণতা সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা মিরাজ রজনীতেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কারো আলোর প্রয়োজন হয়, তাকে বিশেষজ্ঞরূপে এ মরুভাস্করের চরণে শরণ নিতেই হয়। স্থান, কাল ও গতির ওপর মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, জড় শক্তিকে সে যে আয়ত্ত করতে পারে,

মানুষের মধ্যে যে বিরাট অতিমানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, মিরাজ সে কথাই প্রমাণ করে। মহানবী (সা.)-এর হযরত ও আহমদ নামকরণের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতাও মিরাজের মধ্যে নিহিত। এ নাম দুটি যে চরম সত্য, তা মিরাজের রাতে প্রমাণিত হয়েছে। মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পরম গৌরব দান করেন। কোনো ফেরেশতা বা কোনো নবী-রাসূল যেখানে উপনীত হতে পারেননি, মুহাম্মদ (সা.) সেখানে উপনীত হয়েছিলেন।

মিরাজ সম্পর্কে অভিযোগ এবং তা নিরসন

রাসূল (সা.)-এর স্ব-শরীরে মিরাজের ওপর কাফিররা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো- প্রবীণ দার্শনিকরা আসমান ভেদ করে ওপরে গমণ করা অসম্ভব বলে মনে করে। পক্ষান্তরে নবীন দার্শনিকগণ আসমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। অতএব, যখন আসমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, তবে দৈহিক মিরাজ কীভাবে সম্ভব? সর্বোপরি নবীন এবং প্রবীণ দার্শনিকগণ এ কথার ওপর একমত হন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা ওপরে শৈত্যমণ্ডল বিদ্যমান এবং প্রবীণ দার্শনিকদের মতে সেখানে অগ্নিমণ্ডল অবস্থিত। কোনো স্থূলকায় বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এ দু'টি স্থান নিরাপদে অতিক্রম করতে পার সম্ভব নয়। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর স্ব-শরীর মিরাজ গমণের কথা বিবেক বিরুদ্ধ।

বাস্তব কথা হচ্ছে, এসব নিছক ধারণা মাত্র। জ্ঞান ও যুক্তির প্রেক্ষিতে এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। সকল তাওহীদবাদী ধর্মে আসমান ভেদ করে নবীদের জন্য আল্লাহর হুকুমে সহজ করা হয়েছে। ইহুদিদের মতে আম্বিয়ায়ে কিরামের স্ব-শরীর জীবিত অবস্থায় আসমানে অবস্থান করা এবং খ্রিস্টানদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিত অবস্থায় আসমানে গমণপূর্বক তথায় অবস্থান করা এবং শেষ যামানায় আসমান থেকে অবতরণ করা স্বীকৃত।

মিরাজের শিক্ষা:

আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব মানা

মিরাজের প্রধান শিক্ষা হলো আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এর স্বীকৃতি। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থায়িত্ব, সংরক্ষণ, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি একমাত্র আল্লাহর দান। যিনি অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী, যাঁর ইচ্ছা ও আদেশ নিরঙ্কুশভাবে (absolutely) আসমান ও যমীনের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, যার হাতে রয়েছে জীবিকার চাবিকাঠি, জীবন-মৃত্যুর রশি এবং যিনি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। মানুষের আনুগত্য, দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য; এ ক্ষেত্রে অন্য কারো ইবাদত না করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, অন্যকারো সার্বভৌমত্ব না মানা। মূলতঃ এ হচ্ছে মিরাজের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা। এ শিক্ষাকেই কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলে এভাবে বলা হয়েছে- তোমার রবের সিদ্ধান্ত যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩১)

পিতামাতার অধিকার সংক্রান্ত

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মৌল ইউনিট হলো পরিবার। তাই মিরাজের দ্বিতীয় শিক্ষায় তামাদ্দুনিক বিষয়ে পারিবারিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে-"পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন, তবে তাদের সঙ্গে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছজ্ঞান করবে না, তাদের সঙ্গে মিষ্ট ভাষায় কথা বলবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল-২৩)

প্রথম আদেশ : পিতামাতাকে 'উহ্' বলা যাবে না।
দ্বিতীয় আদেশ: ধমক দেয়া, এটা যে কষ্টের কারণ আহা বলাই বাহুল্য।
তৃতীয় আদেশ: তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্রস্বরে কথা বলতে হবে।
চতুর্থ আদেশ: পিতামাতার সাথে নম্র ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় এবং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হতে পারে।
পঞ্চম আদেশ: তাঁদের প্রতি ভালো ব্যবহারের সাথে সাথে তাদের জন্য দোয়া করারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"

ধনী-গরীবের পারস্পরিক সম্পর্ক

মিরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, সমাজে যারা বিত্তহীন, বাস্তুহারা, মযলুম, বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে, কোথাও মাথা গোজার জায়গা নেই, অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এদের সম্পর্ক বিত্তবানদে কর্তব্য সাহায্য ও সহযোগিতা করা। এ সম্পর্কে সূরা বলা হয়েছে- "আপন আত্মীয়-স্বজনদের পাওনা বুঝে দাও এবং মিসকীন ও পথিকদের হক বুঝিয়ে দাও। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬)

মিতব্যয়িতা

মিরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে- মানুষকে মিতব্যয়ী হতে হবে, যেন সে নিজের ব্যয়বাহুল্য দ্বারা নিজের ও অপরের সর্বনাশ ডেকে না আনে, কার্পণ্য করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করাও যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "তোমরা হাতকে না একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে, আর না একেবারে খুলে দেবে (কৃপণও হয়ো না এবং অমিতব্যয়ীও হয়ো না) জেনে রেখো তা করলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-২৯)

দারিদ্র্যের জন্য সন্তান হত্যা

মিরাজের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে দারিদ্র্যের ভয়ে, খাদ্যাভাব ও সাংসারিক অভাব-অনটনের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা না করা। বর্তমান বংশধরদের জীবিকার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ যেভাবে করছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্যও ঠিক তেমনি করবেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল্লাহ বলেন-"তোমরা অভাবের তাড়নায় স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তাদের ও তোমাদের জীবিকা দান করে থাকি।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩১)

ব্যভিচার ও অশ্লীলতা বর্জন করা

মিরাজের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে উন্নত ও নৈতিক চরিত্রবান হওয়া, ব্যভিচার অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই ব্যভিচার থেকে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং সমাজ থেকে এটিকে মূলোৎপাটন করতে হবে। যৌন উত্তেজক সকল প্রকার সম্ভাব্য পথ ও উপায় উপাদান বিলুপ্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ বলেন-"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, অবশ্যই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩২)

অন্যায়ভাবে হত্যা বন্ধকরণ

মানুষের জীবন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পবিত্র। তাই অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা হারাম। তাই, শুধু আল্লাহ প্রদেয় নির্দিষ্ট বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণে রক্তপাত করা চলবে না। আল্লাহ বলেন- "তোমরা ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করবে না এবং যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি। যেন তারা হত্যা সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম না করে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৩)

এতিম-অসহায়দের সম্পদ ভক্ষণ

এতিমের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিনদের কর্তব্য। যতদিন পর্যন্ত না তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ততদিন তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার দিকে বিশেষ নযর দিতে হবে। আল্লাহ বলেন-"এতিমের মাল ভক্ষণ ও স্পর্শ করো না। একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)

ওয়াদা পালন করা

আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতির নামে যে ভণ্ডামী চলে মিরাজের এ শিক্ষার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ মানুষকে তার প্রতিটি অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির জন্য একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"এবং অঙ্গীকারপূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)

ব্যবসা নীতি

মিরাজের এ শিক্ষা ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন ও পণ্য-ক্রয়-বিক্রয়কালে সঠিকভাবে ওজন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিমাপ যন্ত্রও নির্ভুল হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিমাণ শুভ।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৫)

অহংকার বর্জন করা

মিরাজের সর্বশেষ শিক্ষা হচ্ছে মানুষকে গর্ব, অহংকার সহকারে চলাফেরা করা চলবে না। কারণ তার অহংকার না পারবে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে, আর না পারবে আসমানকে অতিক্রম করতে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"পৃথিবীতে অহংকার ও

দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই তুমিতো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।"

শিক্ষার্থীর কাজ	**মিরাজের পরিচিতি তুলে ধরুন।**

'মিরাজ' কী?	মিরাজের রাত্রিতে মহানবী (সা.) কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ লাভ করেন?	আল-কুরআনের কোন্ সূরায় মিরাজের আলোচনা এসেছে?	মিরাজে মহাবী (সা.) কয়জন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন?

সারসংক্ষেপ :

আল্লাহ তায়ালা তদীয় রাসূলকে তার অলৌকিক নিদর্শনাদী প্রদর্শনের জন্য পৃথিবীর সীমারেখা থেকে আরশে আযিমের কাছে নিয়ে যান। তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামসহ বিশাল সৃষ্টিজগতের কুদরত দেখানোর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে চলমান কষ্ট-মুসিবতকে পায়ে মাড়িয়ে আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকার প্রেরণা দান করেন। মিরাজের ঘটনার পর পরই হিজরতের মাধ্যমে তার বাস্তব পর্যবেক্ষণ উদ্ভাসিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত আবুবকর (রা:)-কে সিদ্দীক উপাধি দেয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি-

(ক) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন (খ) ভণ্ড নবীদের দমন করেন

(সা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করেন (ঘ) মিরাজের ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন

২। নবুয়াতের কোন সালে মিরাজ সংঘটিত হয়?

(ক) দশম (খ) দ্বাদশ

(গ) একাদশ (ঘ) ত্রয়োদশ

৩। মিরাজের রাত্রে মহানবী মক্কা থেকে কোন শহরে গমন করেছিলেন?

(ক) মদীনায় (খ) তায়েফ

(গ) কূফা (ঘ) ফিলিস্তিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রফেসর হায়দার একদিন শিক্ষার্থীদের এক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দেন। মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানের স্পষ্ট ধারণার অনেক আগেই একজন মহামানব পৃথিবী ও সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। অনেকেই এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু তাঁর অলৌকিক এ ভ্রমন বিষয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের অনেকের নানা প্রশ্নের জবাব তিনি তাৎক্ষণিক প্রদান করেছিলেন। বিজ্ঞানের আধূনিক আবিস্কারের কারণে তাঁর সেই ভ্রমণ বাস্তব সম্মতই মনে হয়।

(ক) মিরাজ অর্থ কী? ১

(খ) কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিরাজের ঘটনা সংগঠিত হয়? ২

(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শেষ লাইন দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে। আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৩.৬ মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হিজরতের ঘটনাবলী ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- সর্বোপরি মুসলিম জীবন ও সমাজে হিজরতের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**হিজরত, আকাবার শপথ, দারুন নাদওয়া, 'সওর' পাহাড়, সুরাকা ইবনে মালেক, সহল ও সুহাইল**

মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন কুরাইশদের নিকট ইসলামপ্রচার করে নিরাশ হলেন তখন তিনি আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র হতে মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যের জন্যে যারা আসত তিনি তাদের কাছে গমন করে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সে সময় মদিনায় আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাজরাজ বসবাস করতো। তাদের আদিবাস ছিল ইয়েমেনে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা শেষ নবীর আগমনের কথা জানত এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা একজন নেতাও সন্ধান করছিল। তারা মদিনার ইহুদিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় সমাগত।

বাইয়াতে আকাবা

আকাবার শপথ বা বাইয়াতে আকাবা ইসলামের ইতিহাসে তথা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। রাসূল (সা.) এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন বিরূপ, অধিকাংশ কুরাইশ যখন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ, সহযোগিতার সকল পথ রুদ্ধ, ঠিক তখন বাইয়াতে আকাবার সূত্র ধরে রাসূল (সা.) ইসলাম প্রচারের এক অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেলেন। মক্কার অদূরে আকাবা নামক উপত্যকায় এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এজন্যে একে 'আকাবার শপথ' বলে।

১. নবুয়তের দশম বর্ষে হজ্জের দিনগুলোতে মক্কা থেকে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে (বর্তমানে যেখানে 'মসজিদে আকাবা' অবস্থিত) ছয় জন লোক বসে কথাবার্তা বলছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, তারা ইয়াসরিববাসী (মদিনা) খাযরাজ বংশীয় লোক। হজ্জের মৌসুমে তারা মক্কায় এসে শুনতে পেল, মুহাম্মদ নামে এক কুরাইশ নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতার কথা বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে কুরআনের কতকগুলো আয়াত পাঠ করে তাদের আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় আর বলে, দেখ, ইহুদিরা যেন আমাদের আগেই ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত না হয়। একথা বলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এটাই আকাবার প্রথম বায়াত বা শপথ।

২. নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজ্জের সময় মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের বারো জন লোক মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাঁদের আবেদন অনুযায়ী দ্বীনি আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মহানবী (সা.) আমর ইবনে মাকতুম এবং মুসয়াব (রা:) কে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে একে দ্বিতীয় বায়াতে আকাবা বা আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলা হয়।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় বায়াতে আকাবায় যেসব মুমিন শপথ নিয়ে মদীনায় গিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন, মুসয়াব (রা:) তাঁদের নেতা ছিলেন। সে বছর মুসয়াব (রা:) এর হাতে বহু লোক মুসলমান হন। তাঁদের মধ্যে ওসায়েদ ইবনে হোযায়ের এবং সাদ ইবনে মুয়াযও ছিলেন। এ দু'ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কারণে বনী আব্দুল আশহালের (আমর ইবনে সাবিত ছাড়া) সকল নরনারী মুসলমান হয়ে গেলেন। এভাবে মদীনায় দ্রুতগতিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। সে বছর মদিনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুখ্যাতি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জ কাফেলা বর্ধিত হারে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করেছিল। এহজ্জ কাফিলায় আনসার মুসলিম এবং কাফিরদের বিরাট দল অংশগ্রহণ করে। এবার ৭৩

জন নারী পুরুষ মক্কায় এসে এক সাথে মহানবী (সা.) এর হাতে আকাবা নামক স্থানে তৃতীয়বারের মতো ওয়াদাবদ্ধ হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে শপথ গ্রহণ করে:

১. আমরা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করব, তাঁকে ব্যতীত আর কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহ বলে স্বীকার করব না, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করব না।
২. আমরা চুরি, ডাকাতি করব না।
৩. আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।
৪. কোনো অবস্থায়ই আমরা সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।
৫. আমরা কারো প্রতি মিথ্যারোপ করব না, কারে প্রতি অপবাদ আরোপ করব না।
৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে আল্লাহর রাসূলের অনুগত থাকব, কোনো ন্যায় কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

আকাবার শপথের গুরুত্ব

রাসূলের জীবনের একমাত্র মিশন ছিল ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ভিত মূলত রচিত হয়েছিল আকাবার শপথের মধ্য দিয়ে। নিম্নে এর গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

ক. আকাবার শপথের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) মদিনায় ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করেন। রাসূল (সা.) এর পাঠানো প্রতিনিধির ভূমিকায় মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

খ. মক্কার নির্যাতিত মুসলিম সমাজের জন্য নিরাপদ একটি আশ্রয় গড়ে ওঠে। আকাবার শপথের মাধ্যমে মদিনাবাসীরা মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে নির্যাতনের সম্মুখীন মুসলমানরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপে মদিনাকে গ্রহণ করে।

গ. নবুয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (সা.) নিরাপদে ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাননি। আকাবার শপথের মাধ্যমে নিরাপদে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মদিনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে ইসলাম বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল।

ঘ. আকাবা ছিল রাসূল (সা.) কর্তৃক মদিনায় হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ। এ শপথে অংশগ্রহণকারী রাসূল (সা.) কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এদিকে মক্কাবাসীদের নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে রাসূল (সা.) মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হিজরত করেন।

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সভা : মক্কার কাফিররা মুসলমানদের সার্বিক বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে সুচিন্তিত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কাফিররা যখন দেখল, মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা নিজ নিজ ধন সম্পদ, যুদ্ধসম্ভার, সন্তান সন্ততি নিয়ে মদীনায় চলে যাচ্ছে, তাদের সাথে মদিনার প্রভাবশালী আওস ও খাযরাজ গোত্র রয়েছে, তখন তাদের মনে ভবিষ্যতের জন্য ভীতির সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরাইশ অকুরাইশ সকল গোত্রের লোকদের এক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। একমাত্র কুরাইশদের আবদে মানাফ [রাসূলুল্লাহ (সা.) এর] বংশকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। কুরাইশদের এ ষড়যন্ত্রের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে- হে মুহাম্মদ (সা.), সে ঘোর বিপদের কথা স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দি করে রাখবে, হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে দেবে- এ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল (আনফাল, রুকু ৪)

তখন আবু জাহল প্রস্তাব করল, আমার মতে তাকে অবিলম্বে হত্যা করে ফেলাই দরকার, তবে একা একজনকে হত্যা করলে মুত্তালিব ও হাশিম (আবদে মানাফ) বংশের লোকেরা হত্যাকারী বা তার গোত্রের ওপর চড়াও হয়ে প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নাশ করার জেদ ধরবে। সেজন্য আমার মত হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবক তরবারি নিয়ে মুহাম্মদকে অনুসরণ করুক এবং সুযোগ পেলে একসঙ্গে আঘাত করে হত্যা করে ফেলুক। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে কোনো গোত্রই দল ছাড়া হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, মুহাম্মদের গোত্র আমাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। শোণিতপণ (দিয়াত) যদি দিতেই হয়, তবে আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করে দেব। এ প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

রাসূল (সা.) তাদের এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে আল্লাহর নির্দেশে আবু বকর (রা:) কে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যে রাতে কাফিররা রাসূলের বাসভবন ঘেরাও করেছিল, সে রাতেই তাদের অলক্ষে নিজের বিছানায় হযরত আলী (রা:) কে শুইয়ে রেখে বের হয়ে পড়েন। মক্কা হতে মদিনার দূরত্ব ছিল প্রায় ২০০ মাইল। রাসূল (সা.) ঐ রাতেই বেশি দূর যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন না, তাই তারা তিন দিন তিন রাত মক্কার অদূরে 'সওর' নামক পাহাড়ের একটি নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। আবু জাহলের নেতৃত্বে আক্রমণকারীরা হযরতকে গৃহে না পেয়ে তাঁর পেছনে ছুটলেন।

কিন্তু তারা কোথাও তাঁকে পেলেন না। হযরত তিন দিন উক্ত গুহায় অবস্থানের পর চতুর্থ দিনে সেখান থেকে বের হয়ে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য রেখে অতি সাবধানে ভিন্ন পথে মদিনার দিকে চলতে থাকেন।

যাত্রাপথে প্রিয় জন্মভূমির পানে তাকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে গভীর মমতায় তিনি বললেন, 'মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার কোলে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়ে তোমায় ছেড়ে চললাম। বিদায়!" এদিকে কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে না পেয়ে ঘোষণা দিল, 'মুহাম্মদ বা আবু বকরকে যে ব্যক্তি বন্দি করে আনতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।" পুরস্কারের আশায় তাঁদেরকে ধরার জন্য অনেকেই তাঁদের পেছনে ছুটল। হযরত পথের মধ্যে বেশ কয়েকজনের থেকে বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর (১২ রবিউল আউয়াল) সোমবার মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে এসে পৌঁছেন। এর তিন দিনের মধ্যেই হযরত আলী (রা:) ও কুবায় এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। হযরত কুবায় ৪দিন অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নবুওয়াতের পর রাসূলের হাতে নির্মিত এটাই প্রথম মসজিদ। তিন দিন পর শুক্রবার মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হন। মদিনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে বিপুল উৎসাহে সাদরে গ্রহণ করেন।

মদিনায় নানা গোত্র নানা দল। সবাই প্রিয়নবীকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে চাইল। হযরত ঘোষণা করলেন, আমার উট যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, সেখানেই আমি অবস্থান করব। দেখা গেল রাসূলের বহনকারী কাসোয়া নামক উটটি বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় এসে এতিম দু'সহোদর সহল ও সুহাইলের জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হযরত জায়গাটি কিনে সেখানে মসজিদের নববী নির্মাণ করলেন। আর তৎসংলগ্ন আবু আইয়ুব আনসারীর বাসভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। নবুওয়তের ১৩তম বছরে হিজরতের ঘটনা ঘটে। সে সময় মহানবী (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মক্কা থেকে মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এ সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে ইতিহাসে হিজরত বলা হয়। তাঁর এ হিজরতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ বছর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) চান্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররমের প্রথম দিন (১৬ জুলাই) থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

হিজরতের কারণ

আল কুরআনের বিবরণে দেখা যায় যে, বিশ্ব ইতিহাসের বেশির ভাগ নবী-রাসূলগণই নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের পথ কাঁটায় ভরা; ফুল বিছানো নয়। রজনী যতই গভীর হয়, সোনালী ঊষার আবির্ভাব ততই নিকটবর্তী হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, মক্কায় খোদাদ্রোহী শক্তির আঘাত যখন চরমে ওঠে তখন সত্যপন্থিরা মাতৃভূমির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের মোড় ঘুরে যায়। তাই ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন- Hijrat is the greatest turning point in the history of Islam. এ হিজরতের মধ্য দিয়ে রাসূল (সা.) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি এ প্রসঙ্গে বলেন, The seer in him now recedes into the background and the practical man of politics comes to the fore.

ক. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

সর্বকালেই আম্বিয়ায়ে কিরাম, সংস্কারবাদী মনীষী ও মহামানবগণ জন্মভূমিতে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহর নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে যেমন এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি, তেমনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও এ রীতির ব্যতিক্রম হয়নি।

বদ্ধমূল ধারণায় আঘাত : চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তিপুজা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম বর্জন করে আল্লাহর একত্ববাদের আহবান মক্কার কাফিরদের সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপসহীন তাওহীদের ঘোষণা জড়বাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এজন্য তাদের মন মানসিকতাই দায়ী। সর্বদা তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনিতে লেগে থাকত। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর তীব্র প্রতিবাদের কারণে কাফির কুরাইশরা তাঁর ওপর রুষ্ট ছিল।

আভিজাত্য ও অহংকার : ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণীতে যখন রক্ষণাশীল বিধর্মী কুরাইশদের মজ্জাগত আভিজাত্য ও কৌলীন্য প্রথা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, 'বংশ, জন্মে বা পৌরোহিত্যের জন্য মানষ কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না।' এ ঘোষণা কুরাইশদের কৌলীন্য

প্রথার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ফলে কুরাইশরা ইসলাম ও ইসলামের বাণীবাহক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্মূল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে।

স্বার্থবাদী সংঘাত : কুরাইশদের ইসলাম ও ইসলামের নবীকে মেনে না নেয়ার আরো একটি প্রকট কারণ ছিলো, ইসলাম নির্মল, নিষ্কলুষ, সরল ও জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায়। আর ইসলামের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের আহবান মক্কার রুক্ষ এবং মরুর দুরন্ত সন্তানদের পাশবিক লালসা, পাপাচার, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, কুসীদ প্রথা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, নরবলি প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে তারা ইসলাম, ইসলামের নবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম হিংস্র রূপ ধারণ করে। হিজরতের পেছনে এটাও একটা শক্তিশালী কারণ।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের আমন্ত্রণ : মহানবীর আগমনের পূর্ব সময়ে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় জঘন্য অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী 'বুয়াস যুদ্ধ' কয়েক যুগ ধরে চলছিল তাতে কোনো সম্প্রদায়ই লাভবান হয়নি। এ অবস্থায় কলহরত আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং শান্তি স্থাপন করতে মদিনার বাসিন্দারা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের অনুসন্ধান করছিল। তাই তারা রাসূল (সা.)-কে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলিসম্পন্ন বলে জানতে পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়।

রক্তের টান : মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক দিয়েই মদিনাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সহৃদয় ও আন্তরিক ছিল। তাই মেহমান হয়ে সেখানে গিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো সকল দিক দিয়ে সুবিধাজনক হবে ভেবে রাসূল (সা.) তথায় হিজরত করেন।

মুসয়াবের দাওয়াতী কার্যক্রম : ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের এক বছর পূর্বে হযরত মুসয়াবকে ইয়াসরিবে প্রেরণ করেছিলেন। মুসয়াবের প্রচারণায় নবী করীম (সা.) সম্পর্কে তথাকার অধিবাসীদের ভালো ধারণা জন্মে। তিনি গেলে ইসলামের প্রচারকার্য আরো বেশি হবে ভেবে তিনি মদিনা যেতে আগ্রহী হন।

খ. বাহ্যিক কারণ : হিজরতের কিছু বাহ্যিক কারণও ছিল, তা নিম্নরূপ-

কুরাইশদের অত্যাচার : আবু তালিব ও খাদিজা (রা:)-এর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের সুমহান আদর্শের একান্ত অনুসারীদেরকে পূর্বেই কুরাইশদের অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল। এ অত্যাচারের ফলে তিনি সাহাবায়ে কিরামসহ মদিনায় হিজরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হত্যার ষড়যন্ত্র : কুরাইশরা ইসলামের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে। আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই রাসূল (সা.)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিলে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিহাসসিদ্ধ কারণ: বিশ্ব ইতিহাসের একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো- Prophets are not honoured in their own lands. এ সত্যের শিকার হয়েছিলেন হযরত মুসা, ঈসা, ইউনুস, নূহ (আ)-সহ অনেক নবী রাসূল। সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও একই পরিণতির শিকার হয়ে তাঁর দেশবাসী আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। এ কারণে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাণিজ্যিক কারণ : মক্কার মুসলিম ব্যবসায়ীরা মদিনার নিরাপদ অবস্থান থেকে সিরিয়ার সাথে অবাধ বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হবে, তাদের পরনির্ভর জীবন যাপন করতে হবে না, হিজরতের পেছনে এটাও অন্যতম কারণ।

আকাবার শপথ : ৬২০ এবং ৬২১ খ্রিস্টাব্দে আকাবার শপথের ফলে বহু মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। এতে মদিনায় ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সেখানে হিজরতের আমন্ত্রণ জানায়।

মক্কার প্রতিকূল জনমত : মহানবী (সা.) যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তার জন্য প্রয়োজন ছিল একদল যোগ্য লোকের, নিজের মিশন সফল করতে তিনি যাদের আনুকূল্য লাভ করবেন, কিন্তু মক্কায় আশানুরূপ এ ধরণের লোক তৈরি না হওয়ায় জনমত প্রতিকূলে প্রবাহিত হতে থাকে। এ কারণে তিনি মদিনায় হিজরতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

হিজরতের ঘটনা

নির্দেশপ্রাপ্তি : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হিজরতের আদেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করেন। হিজরতের আদেশ পৌঁছানোর সময় জিবরাঈল (আ) বললেন, আজ রাতে আপনি শয্যায় যাবেন না। তিনি ঠিক দুপুরে সিদ্দীকে আকবর (রা:)-কে হিজরতের সংবাদ দেন। রাতে আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর গৃহ বেষ্ট করে দাঁড়ায়। তিনি হযরত আলীকে নিজের বিছানায় চাদরে ঢেকে শুইয়ে দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত- তেলাওয়াত করতে করতে বের হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘর ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে কাফিরদের ওপর এক মুষ্টি মাটি ছিটিয়ে দিয়ে

সকলের অলক্ষ্যে আবু বকর (রা:)-এর গৃহে চলে যান এবং তাঁকে নিয়ে মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বত গুহায় সাময়িক অবস্থান গ্রহণ করেন। যাওয়ার সময় হযরত আবু বকর (রা:)-এর পুত্র আবদুল্লাহ, কন্যা আসমা ও আয়িশাকে বলে গেলেন, তারা যেন প্রতিদিন সন্ধ্যারাতে চুপি চুপি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) তিন দিন সওর গুহায় অবস্থান করেন। গুহার মুখে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর নির্দেশে মাকড়সা জাল বুনে, পাখি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসন্ধানে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পুরনো গুহা মনে করে ফিরে যায়।

পুরস্কার ঘোষণা : কুরাইশ বীরেরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসন্ধানে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে লাগল। কুরাইশ নেতারা ঘোষণা করল, মুহাম্মদ অথবা আবু বকরকে যে ব্যক্তি বন্দি করে আনতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। মুদলেজ গোত্রের সুরাকা ইবনে মালেক নামক এক অশ্বারোহী যুবক রাসূলুল্লাহ (সা.) (সা.)-এর সন্ধান পেয়ে সদলবলে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়, কিন্তু কী আশ্চর্য! সুরাকা যখনই নিকটবর্তী হয়েছে, অমনি তার অশ্বের সম্মুখ পদদ্বয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। সে ভীত হয়ে পড়ে। অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে ওয়াদা করে, সে আর রাসূলের পিছু ধাওয়া করবে না। সে তিনবার চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্পর্শ করতে পারেনি।

সাদর অভ্যর্থনা : রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় শুভাগমন করছেন, পূর্বাহ্নে এ সংবাদ পেয়ে মদিনাবাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে ওঠে নগর প্রান্তরে এসে সূর্যের কিরণ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত চিত্তে মহানবী (সা.)-এর আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। অন্যদিনের ন্যায় রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের প্রতীক্ষার পর ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময় জনৈক ইহুদি দুর্গের ওপর থেকে দেখতে পেল এক ছোট্ট কাফিলা মদিনা পানে অগ্রসর হচ্ছে। তার বুঝতে বাকি রইল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে ওঠে, মদিনাবাসী মুসলিমরা প্রস্তুত হও, তোমাদের নবী আসছেন। ইতোমধ্যে আমর ইবনে আওফ উচ্চঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দেন। সাথে সাথে সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে লাগল। সে তাকবীরের আওয়াযে গোটা শহর মুখরিত হয়ে ওঠে এবং আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সবাই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিনয় সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়।

মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে যে উঁচু বসতি রয়েছে তাকে 'আলিয়া' বা কুবা বলা হয়। এখানে আনসারদের বহু পরিবার বসবাস করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানকার আমর ইবনে আওফ গোত্রের কুলসুম ইবনে হেদাম-এর ঘরে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে ইসলামের প্রথম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মদিনাভিমুখে যাত্রা : ইবনে আওফ গোত্রের কুলসুম ইবনে হিদামের ঘরে ৪৪ দিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় কাসওয়া নামক উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। সে দিন ছিল শুক্রবার। পশ্চাতে ছিলেন আবু বকর (রা:)। উট সামনে এগিয়ে চলতে লাগল, ভক্তবৃন্দ তাঁর পশ্চাতে শ্রেণিবদ্ধভাবে নারায়ে তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মিছিল সহকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তিনি বনী সালিম গোত্রের মহল্লায় উপনীত হন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) একশ জন সাহাবী নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুমুআর সালাত।

হিজরতের সন-তারিখ : নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে হিজরত সংঘটিত হয়। সে সময় মহনবী (সা.)-এর বয়স ৫৩ বছর। সফল মাসের শেষে রবিউল আউয়ালের প্রথম দিকে সোমবার দিন তিনি মক্কা ত্যাগ করেন। সোমবার অথবা শুক্রবার ১২ রবিউল আউয়াল তিনি কুবায় পৌঁছান। সেখানে ৪ দিন অবস্থানের পর শুক্রবার মদিনা শহরের দিকে যাত্রা করেন। সে দিনই বিকেলে আবু আইউব আনসারী (রা:)-এর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন।

হিজরতের গুরুত্ব ও ফলাফল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরত বা মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন একটি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হলেও ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অতুলনীয়। পি কে হিট্টির ভাষ্যমতে, হিজরতের মাধ্যমে মক্কী জীবনের অবসান এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়।

ধর্মীয় গুরুত্ব : হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম একটি সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে সংখ্যারিষ্ঠের জীবনব্যবস্থায় এবং মদিনা মুসলমানাদের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ মদিনা নগরী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় ও খুলাফায়ে রাশিদার আমলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল। এখানে এসে মহানবী (সা.) শুধু সম্মানিত মেহমানরুপেই সম্বর্ধিত হননি; বরং কালক্রমে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রেরও প্রধান হলেন। মদিনায় ইসলাম দিন দিন শক্তিশালী হতে লাগল। এতদিন পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনা স্বার্থকতায় রুপ নেয়।

রাজনৈতিক গুরুত্ব : মদিনায় হিজরতের পর ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন বাস্তববাদী বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা

ভবিষ্যত বৃহত্তর ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়ক হয়। এ সম্বন্ধে পি কে হিট্টি বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দর্শন তাঁর জীবনের পটভূমিকায় স্থিতি লাভ করল, আর জেগে উঠল রাজনীতির বাস্তব জীবন।" ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হিজরতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন।

সামাজিক গুরুত্ব : মদিনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিপুল কৃতিত্ব অর্জন করেন। সর্বপ্রকার সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে তিনি দাস প্রথা লোপ, বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি সামাজিক আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। তিনি একটি নতুন সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পারিবারিক সংগঠন নির্মাণ করেন, যা পূর্বের সকল বিধান ও সমাজ সংগঠন অপেক্ষা উন্নততর ছিল। হিজরতের মাধ্যমেই রাসূল (সা.) রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত হন এবং সমাজের সকল স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন।

যুগান্তকারী ঘটনা : মদিনায় হিজরত মহানবী (সা.)-এর জীবনের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। এর ফলে তাঁর সাফল্য ও বিজয়ের নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- The Hijrat, with which the Makkan period ended and the Madinese period began, proved a turning-point in the life of Muhammad, leaving the city of his birth as a despised Prophet, he entered the city of his adoption as an honurded chief.

হিজরতের পর পরই মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম প্রচারে সুযোগ-সুবিধা লাভ : মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কাবাসীদের অবর্ণনীয় জোর-জুলুম সহ্য করেছিলেন, কিন্তু হিজররেত ফলে তিনি তাদের নাগালের বাইরে এসে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ লাভ করেন। এখানে তাঁর নিজের এমনকি অনুসারীদেরও নিরাপত্তার কোনোই চিন্তা ছিল না। তাই তিনি নিশ্চিন্তে ইসলামের প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রাষ্ট্র সংগঠন : মদিনায় মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম গোত্রীয় কলহ ও সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সব গোত্রের মধ্যে একতা স্থাপন করতে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কালক্রমে একে কেন্দ্র করেই বিশ্বজোড়া ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান মনোনীত হন।

সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বুঝলেন, মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই তিনি একটি বিধিবদ্ধ সনদ প্রবর্তন করেন। এ সনদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়। ইতিহাসে এটি মদিনা সনদ নামে পরিচিত এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে সমাদৃত।

কলহের অবসান : মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর মদিনার বিবদমান সকল গোত্রের দ্বন্দ্বকলহের অবসান ঘটে। মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে আওস ও খাযরাজসহ সকল গোত্র কলহবিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম : মদিনায় হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। দূত মারফত বিশ্বের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট মহানবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ লাভ করেন।

হিজরী সন প্রবর্তন : হিজরতকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা:) এর শাসনামলে হিজরী সনের প্রবর্তন করা হয় যা হিজরতের ঘটনার স্মারক হিসেবে যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**হিজরত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।**

হিজরত শব্দের অথ কী?	হিজরতের সময় মহানবী (সা.)এর সফরসঙ্গী কে ছিলেন?	হিজরতের সাথে কোন গুহার নাম সম্পর্কিত?	হিজরতকে কেন্দ্র করে কোন সালের উদ্ভব হয় ?

সারসংক্ষেপ :

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর তাঁর নতুন জীবন শুরু হয়। তাঁর জীবনের এ অধ্যায় খুবই ঘটনা বহুল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। আর মদিনায় এসে তিনি রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মক্কার কাফিররা কার নেতৃত্বে যুবকদেরকে দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যাকারী দল গঠন করে?
(ক) আবু জাহল (খ) ওতবা
(গ) শায়বা (ঘ) আবু সুফিয়ান

২। আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল-
(ক) বন্ধুত্ব (খ) মৈত্রীভাব
(গ) চরম শত্রুতা (ঘ) তুমুল যুদ্ধ

৩। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে দূর হয়-
i. মক্কা জীবনের লাঞ্ছনা ii. অবমাননা iii. ভয় ভীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রসূলপুরের চৌধূরী ও পাটওয়ারী বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাদ চলে আসছিল। বিবাদমান সিলসিলা অনুসারীদের মধ্যে কোন্দল, রেষারেষি, উগ্রভাবাবেগে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় সুলাইমান শমসেরী উক্ত এলাকায় আগমন করে সকল বংশ ও অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ-কোন্দল দূর করার লক্ষ্যে একটি শান্তি চুক্তি প্রণয়ন করেন। এতে রসূলপুরে স্থায়ী শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) মহানবী (সা.) কত সালে হিজরত করেন? ১
(খ) রাসূল (সা.) ও তাঁর পরিবারের গিরি সংকটের অবসান ঘটল কিভাবে? ২
(গ) সুলাইমান সাহেবের চুক্তিনামা ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুলাইমান শমসেরীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২	: ১. (ক)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩	: ১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪	: ১. (ক)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫	: ১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬	: ১. (ক)	২. (গ)	৩. (ঘ)